# সাক্ষাৎকারঃ বিজ্ঞান-লেখক ও গবেষক ডঃ ড্যানিয়েল ডেনেট

## পালকির তরফ থেকে – কৌস্তুভ অধিকারী

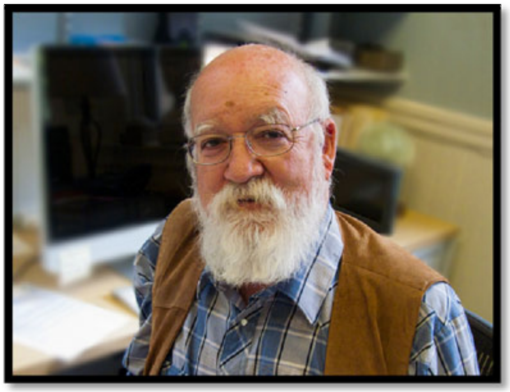

*পালকিতে এই প্রথম আমরা বাংলার বদলে ইংরাজি ভাষার কোনো লেখকের সাক্ষাৎকার পেয়েছি। তাই পাঠকেরা যাঁরা ডঃ ডেনেট-এর সম্পর্কে অবগত নন, তাঁদের জন্য জানাই, প্রফেসর ড্যানিয়েল ডেনেট বস্টন শহরস্থিত টাফ্‌ট্‌স্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কগনিটিভ সাইন্স' গবেষণাবিভাগের প্রধান, এবং একজন সুবিদিত বিজ্ঞান-লেখক। বিবর্তনের উপর 'ডারউইন'স ডেঞ্জারাস আইডিয়া' (১৯৯৫) বইটি লিখে ইনি প্রচুর জনপ্রিয়তা পান। আর এনার সর্বাধিক 'বিতর্কিত' বইটি হল 'ব্রেকিং দা স্পেল – রিলিজিয়ন অ্যাজ এ ন্যাচারাল ফেনোমেনন' (২০০৬), যাকে আধুনিক নাস্তিকতা-চর্চার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বলে মনে করা হয়, এবং যা লিখে ইনি ব্রিটিশ জীববিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স, আমেরিকান সাংবাদিক ক্রিস্টোফার হিচেন্স, ও আমেরিকান নিউরোসাইন্স গবেষক স্যাম হ্যারিসের সাথে 'ফোর হর্সমেন অফ নিউ এথেইজম' বলে খ্যাতি পান। খুব সম্প্রতি ইনি তাঁর গবেষণার বিষয় নিয়ে 'ইনসাইড জোকস: ইউজিং হিউমার টু রিভার্স-ইঞ্জিনিয়ার দা মাইন্ড' (২০১১) বলে আরেকটি বই প্রকাশ করেছেন।*

*অতএব এনার সাক্ষাৎকার নেবার সুযোগ পেয়ে একটি 'বিগ ফিশ'কে ধরার আনন্দই পেয়েছি বলা চলে। আর এই বিশালদেহী শ্বেতশ্মশ্রু অমায়িক ভদ্রলোক যে কেবল নির্ধারিত আধঘন্টার বদলে আমায় প্রায় ঘন্টাখানেক প্রশ্ন করার সুযোগ দিয়েছিলেন তাই-ই নয়, সানন্দে একটি বইতে অটোগ্রাফ করে দেন, ওনার সেক্রেটারিকে বলে ওনার সঙ্গে একটা ছবি তুলিয়ে দেন, এবং আসার সময় 'অগ্রণী যুক্তিবাদী'দের একটি পোস্টারও উপহার দিয়েছিলেন।*

**প্রথমেই প্রশ্ন করি, আপনি কি কখনও ভারতে গিয়েছেন?**

না, আমি যাইনি! সত্যি বলতে, ওটাই একমাত্র প্রধান দেশ যেখানে আমার যাওয়া হয়নি।

**তাহলে আশা করব, ভবিষ্যতে কখনও নিশ্চয়ই যাবেন...**

আমিও তাই আশা রাখি! মুশকিল হল, দু-তিনদিনের ঝটিকাসফর আমি করতে চাই না; ওখানে গেলে হাতে কিছু সময় নিয়ে ঘুরতে চাই, কিন্তু জানেনই তো, মাসখানেক সময় বের করা খুবই কঠিন...

**আপনি কী ছোট থেকেই নাস্তিক ছিলেন?**

ছোটবেলায় আমিও গির্জার 'সানডে স্কুল'-এ যেতাম অন্য অনেকের মতই। আমার পরিবার তেমন একটা ধার্মিক ছিল না – আমার মা আমাদের সঙ্গে চার্চে যেতেন না, তিনি অন্য একটা চার্চে যেতেন যার পাদ্রীর কথা তাঁর বেশি ভালো লাগত। তাই বলতে গেলে আমি প্রথাগত প্রোটেস্ট্যান্ট শিক্ষাই পেয়েছি, বাইবেল পড়েছি, চার্চের কয়্যারে গেয়েছি... কিশোরবয়সে অন্য অনেকের মতই ধর্মে বেশ আগ্রহী ছিলাম খানিকটা সময়। কিন্তু একসময় আমার মনে হল, 'এসব কিছুই তো আসলে আমার বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না!'

**তা এক সাধারণ অবিশ্বাসী থেকে কখন আপনি একজন প্রকাশ্য, সরব নাস্তিক হয়ে উঠলেন?**

তুলনায় সম্প্রতি। মনে হয় এটা আমেরিকার ধর্মীয় রক্ষণশীল গোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান আপত্তিকর কাজকর্মের জন্য, বিশেষত তাদের বাড়তে থাকা রাজনৈতিক প্রভাবের ফলে। সেটাই আমাকে নাড়া দেয়, এই দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার মধ্যে আমার যে চুপ করে বসে থাকা উচিত নয় তা মনে করিয়ে দেয়।

এর সূত্রপাত এইভাবে – নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় আমি একটা উপসম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখেছিলাম, 'ব্রাইটস'দের উপর।

রিচার্ড ডকিন্স আমাকে এই 'ব্রাইটস' ধারণাটার কথা জানিয়েছিলেন। তিনি ব্রিটেনের গার্ডিয়ান পত্রিকায় একটা লেখা দিয়েছিলেন এ বিষয়ে, আর আমি নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকায়। লেখাটা প্রকাশিত হয়েছিল জুলাই ২০০৩-এ, আর সেটা অভাবনীয় সাড়া পায়। আমি সারা দেশ থেকে শয়ে শয়ে মানুষের প্রতিক্রিয়া পাই। তাঁদের অনেকে আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, একবার যখন এই বিষয়টা ধরেছি, তখন এখানেই যেন থেমে না যাই।

নাস্তিকতার উপর একটা বই লিখব, এমন কখনই ভাবিনি। কিন্তু এই বিষয়টা নিয়ে প্রায়শই ভাবনাচিন্তা করতাম বলে, একটা বই লেখার ইচ্ছা হয়েছিল, সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তন আর ধর্মকে একটা সাধারণ, প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক ঘটনা হিসাবে দেখিয়ে। তখনই 'ব্রেকিং দা স্পেল' লেখায় মনস্থির করি।

এক অর্থে সেটা আমার মূল 'কগনিটিভ সাইন্স' গবেষণার থেকে অনেকটাই ঘুরপথ। তাই আমার গবেষণার জ্ঞানকে আমি ওই পরিপ্রেক্ষিতে কাজে লাগানোর চেষ্টা করি। তাও, এ নিয়ে আমাকে অনেকটা দূর চলে আসতে হয়। এতে আমার কোনো ক্ষোভ নেই, তবে আমি আমার মূল বিষয়, মস্তিষ্কের সচেতনতার তত্ত্ব, নিয়ে কাজের মধ্যে ফেরত আসার চেষ্টা করছি।

**খ্যাতিমান নাস্তিক-যুক্তিবাদীদের প্রায় সবারই নিজস্ব ওয়েবসাইট রয়েছে, সেখানে তাঁরা ব্লগও লিখে থাকেন। আপনি মাঝেসাঝে সংবাদপত্রে কিছু উপসম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখলেও, এই নিয়ে আপনার তেমন কোনো সাইট তো নেই?**

তা ঠিক। কিন্তু যদি তেমন কিছু করতাম, তাহলে আমার কাজের পিছনে আরো কম সময় দিতে পারতাম! রিচার্ড ডকিন্স অবসর নিয়ে নিয়েছেন, হিচেন্স তো একজন সাংবাদিকই, লেখালিখিই তাঁর পেশা, আর স্যাম হ্যারিস বয়সে তরুণ, তার উৎসাহ অনেক বেশি, আর তাই সে তার নিউরোসাইন্স কাজের পাশাপাশি এসবে অনেকটাই সময় দেয়। এদের পক্ষে এতে সময় দেওয়া সম্ভব, কিন্তু আমার হাতে অনেকগুলো প্রজেক্ট...

তবে একেবারেই সম্পর্কবিযুক্ত আছি, তা নয়। লিন্ডা লাস্কোলা'র সাথে আমরা যে প্রজেক্টটা করছি, অবিশ্বাসী হয়ে পড়া পাদ্রীদের সাথে বিশদ গোপনীয় ইন্টারভিউ নিয়ে, সেটা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং তার পিছনে আমায় অনেকটাই সময় দিতে হয়! আর এই কাজটার সাথে যুক্ত থাকতে পেরে আমি আনন্দিত।

**তাহলে ওই বিষয়ে কিছু কথা বলা যাক। পরিসংখ্যানের ছাত্র হিসাবে একটা প্রশ্ন করি। এই নিয়ে প্রথম প্রবন্ধটি আসে ২০১০ সালে, যেখানে আপনারা বলেছিলেন যে এই অবস্থা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এমন অনেকেই আছেন সারা দেশ জুড়েই, তবে ঠিক কতজন, সে বিষয়ে কোনো এস্টিমেট আমাদের হাতে নেই। তা প্রজেক্ট যখন আরো অনেকদূর এগিয়েছে বলছেন, ওই বিষয়ে কোনো আন্দাজ পাওয়া গেছে?**

আমরা এই কাজের দ্বিতীয় স্তর প্রায় শেষ করে এনেছি। লিন্ডা আরো অনেক লোকের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন, আমরা আমাদের জ্ঞান আরো অনেকটাই বাড়াতে পেরেছি। এখনও অবশ্য কিছু কিছু অংশ আছে যাদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব হয়নি – অনেক প্রটেস্ট্যান্টদের পেলেও তেমন বেশি ক্যাথলিকদের পাইনি, অবশ্য কিছু মরমন পেয়েছি। আমরা কোনো ইমাম'কে পাইনি – সহজবোধ্য কারণেই কোনো মুসলিম নেই আমাদের প্রজেক্টে – অমন যে কেউ তাদের মধ্যে নেই তা নয়, কিন্তু তা স্বীকার করতে গেলে তো তাদের প্রাণসংশয় হয়ে পড়বে। ধর্মপ্রচারকের পদে থেকে বিশ্বাস হারানো সবার পক্ষেই সমস্যাজনক, কিন্তু মুসলিমদের জন্য বিশেষ করে।

আর এখনও অবধি ফলাফল খুবই উৎসাহজনক। লিন্ডার রিপোর্ট লেখা শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি। আমাদের কাছে এখনও মোট সংখ্যার কোনো এস্টিমেট নেই, কিন্তু আমরা নিশ্চিত যে এমন লোক মুষ্টিমেয় নয় – যে সব চার্চের পদাধিকারী লোকজন এই প্রজেক্টের সমালোচনা করেছে, তারা কিন্তু কেউই বলে নি, "না না,

এ সব বানানো কথা, দুয়েকজনের ব্যাপারকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বড় করা...” – তারাও সবাই জানে যে এরকম প্রায়ই ঘটে।

তৃতীয় স্তরে হয়ত আমরা কোনো ন্যাশনাল সার্ভের পরিকল্পনা করব, যাতে কিছু এস্টিমেট পাওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে।

**দ্বিতীয় স্তরে কতজন লোককে পেয়েছেন?**

পাকা সংখ্যাটা মনে নেই, তবে প্রাথমিক স্তরে যত জনকে পেয়েছিলাম তার দ্বিগুণেরও বেশি।

আর এর থেকে দ্বিতীয় একটা প্রজেক্ট শুরু হয়েছে যার সঙ্গে আমি সরাসরি জড়িত নই – কারণ তা সম্ভব নয় – সেটার নাম ‘দ্য ক্লার্জি প্রজেক্ট’[১]; আর আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই তার ওয়েবসাইটও চালু করে দেওয়া হবে। এটা সযত্নে সুরক্ষিত করা একটা ওয়েবসাইট, যেখানে প্রাক্তন এবং বর্তমান পাদ্রীরা এসে এই বিষয়ে নিরাপদে আলোচনা চালাতে পারবেন, যাঁরা দোটানার মধ্যে আছেন তাঁদের সাহায্য করতে পারবেন। এবং তাই জন্যেই, আমার মত লোক সেটায় অ্যাকসেস পাবে না।

এটা সীমিত লোকেদের মধ্যে বেশ কয়েক মাস ধরে চলছে ইতিমধ্যেই, ওই পাদ্রীরাই চালাচ্ছেন। লিন্ডা এটা তৈরি করতে অনেক সাহায্য করেছেন, কিন্তু আমার মতই তাঁরও সরাসরি অ্যাকসেস নেই, যেহেতু উনি পাদ্রী নন। এটা তৈরি করতে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা দিয়েছে রিচার্ড ডকিন্স ফাউণ্ডেশন, আমিও কিছু সাহায্য করেছি। সব মিলিয়ে পাবলিক সাইট চালু হয়ে যাবে শিগগিরই।

**কোনো অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট, যেমন প্যাট কন্ডেল-এর ইউটিউব ভিডিও চ্যানেল, এঁদের কাজ দেখেন কি কখনও?**

ইমেলের পিছনেই আমার অনেকটা করে সময় চলে যায়! আর আমি ইন্টারনেট-চারী তেমন একটা নই। আমার দুর্দান্ত কিছু সংবাদপ্রেরক আছেন যাঁরা আমাকে বাছা বাছা কিছু জিনিস পাঠান, আর আমি তাঁদের বিচারবুদ্ধির উপরেই ভরসা রাখি। তার উপরে যদি আমি নিজে থেকে নেটে গিয়ে খোঁজখবর করতাম, তাহলে অনেকটা সময় নষ্ট হত, আর ‘ডিমিনিশিং রিটার্ন’এর ফলে বেশি তেমন একটা লাভও হত না।

**ধর্মকে ব্যবচ্ছেদ করে বই লেখার পর কি আপনি কোনো হুমকি-ধমকি পেয়েছেন?**

বইটা বেরোনোর আগে অনেকেই আমাকে বলেছিল যে আমি অনেক হুমকি পাব, আমার বিপদের আশঙ্কা হবে। আমিও জানতাম যে তা হতে পারে, তাই আমরা ভেবেচিন্তে কিছু প্রাথমিক সতর্কতা রেখেছিলাম। আর আমার একটা ফাইল আছে, যাতে বেছে বেছে ‘হেট-মেল’গুলো রাখা থাকে। তবে খুব বড় কোনো ব্যাপার কিন্তু হয়নি বলতে গেলে।

**কীরকম সতর্কতা নিয়েছিলেন?**

প্রথমদিকে যতটা নিয়েছিলাম, এখন আর ততটা নিই না। আমার সফরসূচি আমার ওয়েবসাইটে দেওয়া থাকে না। আমি যেখানে যাচ্ছি তারা আমার বক্তৃতার কথা বিজ্ঞাপিত করতে পারে, কিন্তু কোথায় কবে যাচ্ছি এমন কোনো তালিকা আমি দিই না। তাই কেউ আমাকে ধাওয়া করতে গেলে তাকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে। এখন অবশ্য সফরসূচি সাইটে দেওয়ার কথা ভাবছি।

---

১ – এই সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয়েছিল ৫ই অক্টোবর। ওই মাসেরই ৭ তারিখ এই প্রজেক্টের ওয়েবসাইট প্রকাশ্যে আসে, **www.clergyproject.org** ঠিকানায়।

**সক্রিয় নাস্তিকদের 'জঙ্গি নাস্তিক' আখ্যা দেওয়া সম্পর্কে আপনার কী মত?**

যদি আপনি দুনিয়ায় কোনো ভালো কাজ করতে চান, কোনো প্রভাব রাখতে চান, যদি অনাদৃত কোনো বিষয়ের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান, তাহলে আপনি যাদের নজর টানতে সক্ষম হবেন তাদের অনেকে তো প্রতিক্রিয়া দেখাবেই – ভালো বা খারাপ প্রতিক্রিয়া – আর যারা খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখাবে তারা তো আপনার নিন্দা, সমালোচনা, চরিত্রহনন করার চেষ্টা করবেই।

তাই আমি এতে অবাক হইনি মোটেই। বরং, আমি উৎসাহ পেয়েছি এই দেখে যে, আমরা 'চার ঘোড়সওয়ার' হয়ত মোট পাঁচ-ছটা বই লিখেছি, কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে অগুন্তি বই লেখা হয়ে গেছে! সেগুলোর প্রত্যেকটাই অবশ্য ফালতু, প্রত্যুত্তরের যোগ্যও নয়। কিন্তু এতগুলো বই যে তাদের লিখতে হয়েছে, আমাদের কাজকে যে তাদের একটা বড়সড় সমস্যা বলে মনে হয়েছে, সেটাই বোঝাচ্ছে যে আমরা কোথাও একটা খোঁচা দিতে পেরেছি বটে। আর তাদের এই রক্ষণাত্মক অবস্থানের খুঁতগুলো ধরিয়ে দেওয়ার কাজটা খুবই মজাদার।

প্রথমে ভেবেছিলাম, এটাকে 'যিশুর জন্য মিথ্যাচার' নাম দেব। কিন্তু তারপর একটা শব্দ মনে এল যেটা আমার বেশি পছন্দ – 'ফেইথ-ফিবিং' বা 'বিশ্বাসনির্ভর মনগড়া প্রচার', কারণ 'তুমি মনগড়া কথা বলছ' বলাটা 'তুমি মিথ্যা বলছ'র মত কড়া অভিযোগ নয়। আমি এর নানারকম নমুনার দিকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা শুরু করি, আর অন্তত একজনের প্রকাশ্য সমর্থন পেয়েছি এই বলে যে, 'হ্যাঁ, ও ঠিকই বলছে, আমি বিশ্বাসনির্ভর মনগড়া কথাই বলতাম, আমি দুঃখিত।'

এটা একটা প্রচলিত অভ্যাস – তারা তথ্যবিকৃতির ইচ্ছা দমন করতে পারে না, তাই তারা মনগড়া কথা বলে ভ্রান্তি ছড়ায়। আর তখন যেটা করণীয়, সেটা খুব সহজ – স্রেফ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দাও, 'দেখেছ, এদের তথ্যবিকৃতির কেমন অদম্য ইচ্ছা? কেন এরা সরল সত্যটা বলতে পারে না?'

**'ফোর হর্সমেন অফ নিউ এথেইজম' কথাটা কে প্রচলন করেন?**

সেটা ঠিক জানি না। তবে কথাটা আমাদের বেশ মনে ধরেছিল।

**বাইবেলে মূল কথাটা ছিল 'ফোর হর্সমেন অফ দি অ্যাপোক্যালিপ্‌স্‌', যারা ধ্বংস, মৃত্যু ইত্যাদির বার্তা বহন করে। এমন খারাপ ইঙ্গিতবাহী কিছুর সঙ্গে সম্পর্কিত হতে আপনার আপত্তি নেই?**

আমার মতে, ব্যাপারটার মধ্যে খারাপ এটাই যে, এতে মাত্র চারজনের জায়গা হয়! আরো অনেক দারুণ যুক্তিবাদী মুক্তচিন্তক লোকজন আছেন, এবং তাঁদের কেউ কেউ হয়ত এই স্বীকৃতিটা না পেয়ে ক্ষুব্ধই হয়েছেন। সেটা অবশ্যই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না, সেটা এই নামের দুর্ভাগ্যজনক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। তাই এই প্রসঙ্গ উঠে এলেই আমি চেষ্টা করি তাঁদের সবাইকেই স্বীকৃতি দিতে, যাঁরা আমাদের মতই কাজ করে চলেছেন, কিন্তু খ্যাতিটা পাননি।

**তাহলে এই চারজনের তালিকায় আরো কিছু নাম ঢোকাতে পারলে আপনি কাদের রাখতেন?**

আমি ঠিক সেটা করতে চাই না – নতুন যদি এই তিনজনের নাম দিই, তাহলে অন্য তিনজন চটে যাবেন!

**আচ্ছা, আপনাদের চারজনের মধ্যে মূল পার্থক্যগুলো কী, বলতে পারেন?**

আমরা চারজন আলাদা ধাঁচের কাজ করি, যার প্রতিটাই করা দরকার। ডকিন্স ধর্মের চূড়ান্ত হাস্যকর, অবান্তর রূপটা তুলে ধরেন চমৎকার ভাবে। হিচেন্স ধর্ম কতটা ক্ষতিকর হতে পারে সেইটা বোঝাতে দক্ষ। আর স্যামের কাজটাও মোটামুটি হিচেন্সের মতনই।

আর আমি? সচরাচর আমি ‘ব্যাড কপ’ বা দুষ্টু লোকের ভূমিকাটা পালন করে এসেছি; এইখানে আমি ‘গুড কপ’ বা ভালো লোকের ভূমিকাটা পালনের সুযোগ পাই। আমি এই বিষয়ে অনেকটা সহানুভূতিশীল, যে ধর্ম মানুষের খানিকটা উপকার করারও ক্ষমতা রাখে, এবং আমাদের সেটা খেয়াল রাখা উচিত, কারণ আমাদের একটা ধর্ম-সম্পর্কহীন বিকল্প পথ খোঁজা উচিত সেই ভালো কাজগুলো করার জন্য। ক্ষতিকর দিকগুলোর সম্পর্কে আমি ওদের সঙ্গে সহমত অবশ্যই। আমি শুধু মনে করিয়ে দিতে চাই, যে এটা একটা মিশ্র ঘটনা, এবং ভালো দিকগুলোর প্রতিও আমাদের সচেতন থাকতে হবে।

যদি ভেবে দেখেন যে ধর্ম একটা প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক ঘটনা, তাহলে দেখতে পাবেন যে এমন আরো অনেক প্রাকৃতিক ঘটনা আছে যার মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়। এই ধরুন বন্যা। বন্যায় অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়, আবার তার উপকারী দিকও আছে। কেউ যদি ছোটবেলায় বড্ড বেশি পরিষ্কার থাকে তবে তার অল্পেতেই অসুখে পড়ার সম্ভাবনাও বেশি। তাই আমাদের এটা স্বীকার করা উচিত, যে অনেক সময় ধর্ম অনেক মানুষেরই সাহায্যে আসে। অনেকটা ওষুধের মত – কড়া ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও কড়া হয়, কিন্তু মাঝে মাঝে কড়া ওষুধই প্রয়োজন।

**হুম, এরকম কথা একজন ‘নাস্তিকতার ঘোড়সওয়ার’-এর মুখে চমকপ্রদই বটে!**

এটাও ওই ‘বিশ্বাসনির্ভর মনগড়া প্রচার’-এরই অঙ্গ – তারা যখন আমাদের সম্বন্ধে লেখে, তখন তারা বলে, আমরা কতটা নির্দয়, আক্রমণাত্মক, আমরা কেমন ধর্ম ধ্বংস করার জন্য উদ্যত হয়ে আছি – আর তারা ডকিন্সের লেখা থেকে একটা উদ্ধৃতি দেয়, হিচেন্সের থেকে একটা, আর হ্যারিসের থেকে একটা, কিন্তু আমাকে বাদ দিয়ে যায়, কারণ আমি তেমন কিছু বলিই নি!

তারা আমাকে উহ্য রাখে, কারণ তাদের চোখে নিন্দনীয় তেমন কড়া কোনো কথা আমি বলি না। তবে তাদের জন্য বলে রাখি, বাকিদের সমালোচনাগুলোর সঙ্গে আমিও সম্পূর্ণ সহমত।

**আমেরিকা, যাকে মোটামুটি নাস্তিকতা আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু বলা চলে, সেখানে ‘নাস্তিকতা’ শব্দটা সবার কাছেই পরিচিত, এবং সবাই জানে যে সমাজে নাস্তিকেরাও রয়েছে, কিন্তু নাস্তিকতার ধারণাটা তেমনভাবে সর্বজনগ্রাহ্যতা পায়নি, যেমন ১৯৮০-৯০’এর দশকে সমকামিতাকে পরিচিতি দেওয়ার জন্য একটা বড় প্রয়াস হয়েছিল। ২০১১ সালের একটা টেলিফোন-ভিত্তিক ‘গ্যালাপ’ সার্ভের ফলাফল দেখছিলাম, যেখানে বলছে, মাত্র ৫০% আমেরিকান কোনো নাস্তিককে তাদের প্রেসিডেন্ট হিসাবে মেনে নিতে রাজি। অন্যদিকে প্রায় ৭০ শতাংশের কোনো সমকামীকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে দেখতে আপত্তি নেই। মরমন ইত্যাদি তুলনায় অল্পখ্যাত ধর্মীয় দলগুলোরও গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি। নাস্তিকতার ধারণায় সেই জোরটা আসছে না কেন?**

হ্যাঁ, সে জন্যই ‘ব্রাইটস’ ধারণাটা একটা সচেতনতা-আন্দোলন হিসাবে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছিল, যাতে নাস্তিক, মানবতাবাদী, যুক্তিবাদীরা একটা ভালো ইঙ্গিতপূর্ণ নাম পায়। আমার মনে হয়, এটা একটা খুব বুদ্ধিমান প্রস্তাব ছিল, যদিও তেমন সফলতা পায় নি। ভবিষ্যতে হয়ত বা পাবে।

আগে ‘সমকামী’ শব্দটা যেমন অবাঞ্ছিত ছিল অনেক আমেরিকানের কাছে, এখন নাস্তিক শব্দটাও অনেকটা তেমন। সমকামী আন্দোলনে ‘গে’র মত ভালো অর্থের একটা শব্দকে গ্রহণ করার আইডিয়াটা দারুণ ছিল। ‘ব্রাইট’ শব্দটাও তেমন হতে পারত।

তবে যদি অতটা এখন না-ও হয়ে থাকে, আমরা খানিকটা সফলতা অবশ্যই পেয়েছি – আমরা নাস্তিকতার ধারণাটাকে একটা গোপনীয় অবস্থান থেকে বের করে পরিচিত করে তুলেছি, অনেকটা সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে। এখন অনেকেই প্রকাশ্যে ‘আমি নাস্তিক’ কথাটা বলছে। আবার অনেকেই ভাবছে, এর

মধ্যে কিছুটা ভালো জিনিস থাকলেও থাকতে পারে। আমার মনে হয়, এটা সবাইকে জানানো দরকার যে, তাদের চারিপাশেই এমন অনেক ভালো মানুষ আছে যারা নাস্তিক। এতে সেলেব্রিটি নাস্তিকরা একটা বড় ভূমিকা রাখতে পারেন। আর এসবে গোঁড়া মানুষেরা যে উত্যক্ত হন, এটা একটা ভালো লক্ষণই।

**এই বিষয়ে একটা 'নব্য নাস্তিক' বনাম 'নরম নাস্তিক' বিতর্ক চলে, যাতে অনেকে বলেন যে আজকালকার নাস্তিকেরা বড় 'চরমপন্থী' হয়ে উঠছে। এই দুই দলকে কীভাবে একসাথে কাজ করার জন্য মেলানো যায়?**

তা জানি না। তবে মনে হয়, অনেকগুলো জিনিস হওয়া দরকার। আমাদের একটা শান্ত, ধীর, স্থির, অবিচ্ছিন্ন, সরল সত্য প্রচার করে যাওয়া দরকার, যে প্রচলিত ধর্মগুলো কতটা হাস্যকর, অর্থহীন, প্রাচীনতম আমলের ধ্যানধারণা, যেগুলো ছেড়ে আমাদের বেরিয়ে আসা দরকার।

আর এইটাও ধার্মিকদের – অনেক ধর্মাচারী নাস্তিকও কিন্তু আছেন – জোর দিয়ে বলা দরকার, যে তাঁরা যতই তাঁদের আচরিত ধর্মকে নিরীহ মনে করুন, ধর্মের একটা বেশ ক্ষতিকর প্রভাব আছে।

ব্রিটিশ লেখক জন গ্রে সম্প্রতি একটা লেখা লেখেন, যার নাম 'বিশ্বাসে বিশ্বাস রাখা' (বিলীভিং ইন বিলীফ), যেটা মনে হয় আমার 'ব্রেকিং দা স্পেল' বইটার 'বিশ্বাসের প্রতি বিশ্বাস' (বিলীফ ইন বিলীফ) অধ্যায়টা থেকে অনুপ্রাণিত। কিন্তু, মজার ব্যাপার, সেখানে তিনি বলছেন, "এটাই প্রথাগত ধর্মের সমস্যা, সেটা মূলত 'বিশ্বাসে বিশ্বাস রাখা', কিন্তু ধর্ম আসলে তা নয়।" এক অর্থে উনি ঠিকই বলছেন, আর সেটাই ছিল আমারও বক্তব্য। কিন্তু উনি যেটায় পরোক্ষ সমর্থন দিচ্ছেন, সেটা হল একটা প্রথাগত ভণ্ডামি – "দেখো বন্ধুরা, আমরা আসলে বিশ্বাসে বিশ্বাস রাখি না, কিন্তু অমন একটা ভান করি কেবল।"

আর সেটাই আমরা ওই প্রজেক্টটায় দেখছি। ডাক্তারিতে যেমন শপথ নিতে হয়, 'প্রথমত, রোগীর কোনো ক্ষতি কোরো না', তেমনই ধর্মে মূল কথাটা হল, 'যারা পবিত্র বইয়ের কথাগুলোকে একদম আক্ষরিক অর্থে নেয়, সেই সরলমতি প্রাচীনপন্থী ভাবনার ভক্তদের বিশ্বাসকেও কিন্তু কখনও খাটো করে দেখো না, আর তাই প্রচার-বেদীতে দাঁড়িয়ে কখনও এমন কিছু বোলো না যা তেমন কাউকে আহত করে।' এ বিষয়ে আমরা প্রায় সরাসরি উদ্ধৃতিই পেয়েছি। আর তাই ধর্মপ্রচারকেরা একধরনের দ্বিচারিতা করে চলেন – যারা সরল বিশ্বাসে চলে, তাদের কাছে তাঁরা দারুণ বিশ্বাসী হিসাবেই অবতীর্ণ হন, কিন্তু উদারপন্থী শ্রোতারা বুঝে নেন যে যা বলা হচ্ছে সেগুলো আসলে রূপক। আর তাঁদের এতে আপত্তি থাকে না, যেহেতু তাঁরা তুলনায় বেশি আধুনিকমনস্ক, তাঁরা সহজেই বুঝে নেন যে এসব রূপক।

কিন্তু তাঁরা কেউই এ নিয়ে কথা বলেন না। আমি তাঁদের কথা বলাতে চাই। আমি এই দ্বিচারিতা নিয়ে সবাইকে সচেতন করতে চাই। আর তার অর্থ, ওই জন গ্রে-র মত লোকেরা আমার সুবিধাই করে দিচ্ছেন। তাই আমি বলতে চাই, "শুনুন, শুনুন! আপনার পাদ্রীকেই সাহস করে জিজ্ঞেস করে দেখুন না? কারণ কেউ তো নিজে থেকেই বেদীর উপর একটা বড় পোস্টার টাঙিয়ে রাখবেন না, যে 'এসব রূপক!'" কেন নয়? তাঁরা যদি নিজের মনে এমনটাই ভেবে থাকেন, তাহলে প্রকাশ্যেই স্বীকার করুন না!

কর্মরত পাদ্রীদের আসলে শৌখিন, ফ্যান্সি তত্ত্বের জন্য সময় নেই। আর ওইসব ধর্মতাত্ত্বিকেরা আসলে একরকম নাস্তিকই – যে তাত্ত্বিক ঈশ্বর তাঁদের ধারণায় আছে, সেটা প্রচলিত বিশ্বাসীর ঈশ্বরভাবনার থেকে বহু দূর।

**ভারতে আমাদের যে মুখ্যত হিন্দু সমাজ-সংস্কৃতি, সেখানে অনেক মানুষই যে ধর্মের পথে ভাবনাচিন্তা করেন বা নানারকম আচার-প্রথা পালন করেন এমন নয়, কিন্তু যারা করে তাদের ভালো চোখে দেখেন, সম্মান করেন – তাঁরা মনে করেন, মানুষের ধর্মবিশ্বাসের প্রয়োজন আছে, এবং তাঁদের সেই প্রয়োজনকে সম্মান দেওয়া উচিত।**

**এই ধারণাটাকে প্রকাশ করার জন্য একটা ভালো নাম খুঁজছিলাম অনেকদিন ধরে। আপনার বইতে 'বিশ্বাসে বিশ্বাস করা' কথাটা পেয়ে তাই খুব আনন্দ হয়েছিল।**

হ্যাঁ, এমনটা অনেকেই করে। আমার মনে হয়, এই আচরণটার প্রতি লোকের নজর কাড়া দরকার ছিল, ব্যাপারটার একটা নাম দেওয়া প্রয়োজন ছিল।

**এটা অনেক যুক্তিবাদীরাই বলেন, যে শিশুরা তো নাস্তিক, ঈশ্বরভাবনাহীন হয়েই জন্মায়, আর ধর্মের বোঝা চাপিয়ে না দিলে নাস্তিক হিসাবেই বেড়ে উঠত...**

যদিও ঠিক ওই কথাটা আমি বলি না, তবে আমিও বলি যে তাদের উপর ধর্মটাকে চাপিয়ে দিয়ে তাদের মস্তিষ্ক-প্রক্ষালন করে ফেলা উচিত না। তাদেরকে সহজাত চিন্তা-ভাবনা-প্রশ্ন-সন্দেহ নিয়ে বেড়ে উঠতে দাও, নিজেরা বুঝেশুনে যদি তারা নাস্তিক হয় তো হবে, ধার্মিক হলে তাই, কিন্তু সবরকম পথ তো তাদের সামনে খোলা থাকবে।

**এই বিষয়ে, আপনি কগনিটিভ সাইন্সের গবেষক বলে, একটা প্রশ্ন করি। গবেষণায় তো দেখা গেছে, শিশুরা যেহেতু খুবই সৃষ্টিশীল এবং কল্পনাপ্রবণ, তারা নির্জীব বস্তুতেও প্রায়ই মানবিক গুণাবলী কল্পনা করে নেয়, এবং অনেক প্রাকৃতিক ঘটনা, যার স্বাভাবিক ব্যাখ্যা আছে কিন্তু তা শিশুদের ধারণার বাইরে, এমন ঘটনার পেছনে কোনো শক্তি বা ব্যক্তির হাত রয়েছে বলে মনে করে নেয়। সেক্ষেত্রে, এমন কি হতে পারে না, যে তাদের ওই কাল্পনিক ব্যক্তিই তাদের একরকম ঈশ্বরচেতনা?**

এই প্রসঙ্গে সেদিন পাওয়া একটা কার্টুনের কথা মনে পড়ে গেল – একটা বাচ্চা তার মায়ের সাথে দাঁড়িয়ে আছে, আর পাশে একজন ভদ্রমহিলা, যার গলায় যিশুর লকেট, আর পরনে একটা টি-শার্ট, যাতে লেখা, 'আমি ওনার সাথে আছি'। তা দেখে বাচ্চাটা জিজ্ঞেস করছে, 'তোমার কি আর এখনও কাল্পনিক বন্ধু রাখার মত বয়স আছে?' এটা একটা দুর্দান্ত কার্টুন, যেটা ভাবছি পরেরবার কোনো বক্তৃতা দিলে ব্যবহার করব।

প্রশ্নের ব্যাপারে বলি, হ্যাঁ, এটাকে আমি বলি 'সচেতন অবস্থান' ('ইন্টেশনাল স্টান্স'), যেখানে কোনো ব্যক্তি এমন একটা অবস্থান নিচ্ছে যাতে কোনো অচেতন বস্তুকে সে একটা সচেতন জিনিস বলে ধরে নিয়ে সেইমত প্রতিক্রিয়া করছে। এটা একটা 'অতিক্রিয়াশীল কর্তা নির্ণয় পদ্ধতি' ('হাইপার-অ্যাক্টিভ এজেন্ট ডিটেকশন ডিভাইস')। আর এটাই বিবর্তনীয় জীববিদ্যায় ধর্মের উৎস। বিপদ দেখলে যেমন রোম দাঁড়িয়ে যায়, তেমনই প্রতিবর্ত ক্রিয়া এখানে কাজ করছে, কোনো ঘটনার পেছনে দ্রুত কোনো কর্তা বা উৎস খোঁজার প্রবৃত্তি, যা আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে গেঁথে গেছে। আর তাই সেটা যখন একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলে, তখন আমাদের উর্বর মস্তিষ্ক ভূত-প্রেত-জ্বীন-পরী দেখতে পায় কল্পনায়।

**আপনার 'ব্রেকিং দা স্পেল' বইটা পড়ার পরে ইন্টারনেটে যখন তার কিছু সমালোচনা বা রিভিউ পড়ছিলাম, তখন একজনের বক্তব্য বেশ ইন্টারেস্টিং লেগেছিল। তিনি মার্ক্সবাদে আলোচিত ধর্মের উৎপত্তির তত্ত্বকে তুলে এনেছিলেন, যাতে বলা হয়েছে, ধর্মের উদ্ভব হয় সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে, এবং তা বুঝতে গেলে মানুষের সামাজিক ইতিহাস অধ্যয়ন করা জরুরী।**

**উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, আমরা ইতিহাসে বহুবার দেখেছি, পুরোহিতেরা এবং শাসকেরা, প্রায়শই একসাথে মিলে, ধর্মকে স্রেফ একটা সুসংগঠিত ব্যবস্থা বা পরিকাঠামো হিসাবে ব্যবহার করেছে, সাধারণ জনতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য; যারা বিরুদ্ধে কিছু বলার চেষ্টা করে তাদের বিধর্মী বা পাষণ্ড হিসাবে দাগিয়ে দমিয়ে রাখার জন্য। যার অর্থ, ওই পুরোহিতেরা ধর্মকে সৃষ্টি করেছে একটা আধ্যাত্মিক চেতনা থেকে নয়, স্রেফ একটা রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে, আর মানুষ সেই ধর্মকে গ্রহণ করেছে বিশ্বাস থেকে নয় বরং নিরাপত্তার প্রয়োজনে।**

**ওই সমালোচক, যিনি সম্ভবত কোনো সমাজতাত্ত্বিক সংঘের সদস্য, অভিযোগ করেছেন যে আমেরিকার শিক্ষাস্তরে (‘অ্যাকাডেমিয়া’) মার্ক্সবাদের আলোচনা থেকে দূরে থাকা হয়, যেটা সম্ভবত ম্যাকার্থি জমানার রয়ে যাওয়া প্রভাব। এবং সজ্ঞানে না হলেও আপনিও তাই ওই তত্ত্বের আলোচনা বাদ রেখেছেন আপনার বইতে।**

**তার বদলে, সেখানে আপনি অন্য নানারকম তত্ত্বের আলোচনা করেছেন ধর্মের উৎপত্তির বিষয়ে। যে প্রধান তত্ত্বটা তুলে ধরা হয়েছে সেখানে, তা বলে, প্রাচীন লোককথা-ভিত্তিক আদিম ধর্মচর্চার (‘ফোক রিলীজিয়ন’) থেকে বর্তমানের প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের (‘অর্গানাইজ্‌ড্‌ রিলীজিয়ন’) উৎপত্তি। তাতেও ধর্মের এই রাজনৈতিক ক্ষমতার ইঙ্গিত করা হয়েছে, কিন্তু সরাসরি এভাবে নয় যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই ধর্মের সৃষ্টি। ওই তত্ত্বের সম্পর্কে আপনার কী মত?**

তাহলে, ওনার বক্তব্য যে আমি ফাঁকি দিয়েছি – মার্ক্সীয় তত্ত্বকে যেমন গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল তা দিইনি?

প্রথমেই স্বীকার করি, ওই দাবিটার পেছনে অনেকটাই সত্য আছে, যে আমেরিকার ওই কমিউনিজম-বিরোধী জমানার প্রভাব এখনও খানিকটা রয়ে গেছে। তাঁর অনুগামীদের অতটা না হলেও, মার্ক্সের লেখা চমৎকার, কিন্তু তা সচরাচর নজরের আড়ালেই রয়ে যায়। আমার মনে হয়, তা বর্তমান শিক্ষাজগতে ফিরিয়ে আনা উচিতই হবে। ওনার কাজ সম্পর্কে আমি খুব অভিজ্ঞ নই, কিন্তু এটুকু জানি যে তার মধ্যে বেশ কিছু ভালো জিনিস আছে। এবং অনেকেই আছেন যাঁরা এ বিষয়ে পারদর্শী, অবশ্য তাঁরা ঠিক মার্ক্সবাদী না, মার্ক্স-বিদ – কান্ট-বিদ’রা যেমন কান্ট-এর বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁরা তেমন মার্ক্স-এর ব্যাপারে।

এবং ওনার এই বিশেষ তত্ত্বটার মধ্যে অনেকটাই সত্যি লুকিয়ে আছে। তবে সেটাকে একবিংশ শতাব্দীর আলোয় আধুনিকীকরণ করা প্রয়োজন। মার্ক্সীয় চিন্তাধারার মধ্যে একটা সরল কার্যকারণ-মূলক প্রবণতা বা ফাংশানালিজ্‌ম্‌ আছে, খানিকটা এইমিল দ্যুর্কেম-এর তত্ত্বের মত, যা বলে যে সামাজিক প্রভাবকগুলো একটা সামগ্রিক জিনিস, যা ব্যক্তির ক্রিয়া হিসাবে ভেঙে দেখা যায় না। এখানে ডেভিড স্লোন উইলসন-এর একটা কথা প্রযোজ্য – উনি বলেন, আমরা এই সামাজিক ফাংশনালিজম-কে গ্রহণ করতে পারি, তবে তা গোষ্ঠীভিত্তিক নির্বাচন (‘গ্রুপ সিলেকশন’)-এর পরিপ্রেক্ষিতে। আমি বলব, মীম-ভিত্তিক (‘মীমেটিক’) ও গোষ্ঠীভিত্তিক নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে। এটা দরকার যে, এই সামাজিক ব্যবস্থাগুলো কীভাবে তৈরি হয়েছিল তার অন্তর্নিহিত পদ্ধতিগুলো উপলব্ধি করা, যেটা মার্ক্সের আলোচনায় মেলে না।

উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, একই কথা ফ্রয়েডের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাঁর কিছু দুর্দান্ত প্রস্তাব আছে, কিন্তু সেগুলো একটা শুষ্ক তত্ত্বের ভাষায় কঠোরভাবে আবদ্ধ। তাকে অন্যভাবে দেখা, বা অন্য কিছুর উপর ভিত্তি করে তাকে ব্যাখ্যা করা, এসবের অনুমতি নেই। আর এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক, কারণ ওই শক্ত, ভঙ্গুর খোলস থেকে বের করে আনতে পারলে তাঁর চমৎকার কিছু অন্তর্দৃষ্টি বেশ কাজে লাগতে পারত।

**কেউ কেউ বলছেন, বর্তমান নাস্তিকতা আন্দোলনের অবস্থা অনেকটা অভিজাত ‘প্রাক্তন-ছাত্র গোষ্ঠী’ (‘ওল্ড বয়েস্‌ ক্লাব’)-এর মত, যেটা মূলত একদল উচ্চশিক্ষিত সচ্ছল শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের একটা সমাবেশ। আপনার কী মনে হয়, এ পরিচয় থেকে এই আন্দোলন কীভাবে বেরিয়ে আসতে পারে?**

হ্যাঁ, এ অভিযোগ আমি শুনেছি। কিন্তু ব্যতিক্রম হিসাবে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য মহিলা কর্মী বা অ্যাক্টিভিস্টও আছেন – বিজ্ঞান-লেখিকা ন্যাটালি অ্যাঞ্জিয়ার, নারীবাদী ও উদারপন্থী বক্তা আয়ান হিরসি আলি, যাঁকে আমার চমকপ্রদ মনে হয়, এবং অবশ্যই তসলিমা; একটু অন্যরকম একজনও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য – টরন্টোর ইরশাদ মাঞ্জি, যিনি নাস্তিক নন, কিন্তু ইসলামের মধ্যে থেকেই তার প্রথাগুলোর কঠোর সমালোচক।

এখানে খেয়াল করা উচিত, যে ধর্মের অবস্থাও একই রকম – ক'জন মহিলা আর পাদ্রী বা পুরোহিত হন? তবে সেই অবস্থা বদলাচ্ছে – আগে খ্রীষ্টধর্মের অনেক শাখায় মহিলাদের পাদ্রী হওয়া নিষেধই ছিল, এখন সেই আপত্তি আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে অনেক যায়গায়। এই পিতৃতান্ত্রিক অভ্যাস তো এত সহজে চলে যাওয়ার নয়।

আমি কিছু অনুমান করতে পারি, যে কেন আরো বেশি মহিলাদের আমরা দেখছি না, কিন্তু সেগুলো আন্দাজে ঢিল ছোঁড়া-ই হবে, সেগুলোকে আমার চিন্তালব্ধ উপলব্ধি বলে ভাবা ভুল হবে।

**তা সেই অনুমানগুলো কী?**

এটা অনেকটা, অল্প কিছুদিন আগে অবধিও দর্শনে আফ্রিকান-আমেরিকানদের স্বল্পতার মত ঘটনা। যদি আপনি একজন প্রতিভাবান আফ্রিকান-আমেরিকান হন, তাহলে আপনার অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার আছে, দর্শনের কচকচি নিয়ে পড়ে থাকার তুলনায়। আপনার প্রতিভা, আপনার বুদ্ধি, আপনার দক্ষতাকে দরকার, এমন অনেক বড় সমস্যা রয়েছে আপনার সমাজে। আর তেমনই, অনেক মহিলা যাঁরা দুর্দান্ত যুক্তিবাদী তার্কিক হতে পারতেন, তাঁরা তাঁদের কাছে আরো বেশি প্রয়োজনীয় নানা কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। তা সেটা অন্যায় কী? আমার তো মনে হয়, খুব বেশি লোকের দার্শনিক হয়ে কাজ নেই, অল্প কয়েকজন দার্শনিক হলেই যথেষ্ট। যদি যেসব মহিলাদের সে দক্ষতা রয়েছে, তাঁদের অন্য কর্মসূচী থাকে – যেমন ধরুন, তাঁদের যদি রাষ্ট্রপতি হওয়ার লক্ষ্য থাকে, তাহলে তাই হোন! সেটা অনেক বেশি দরকারি – 'চার ঘোড়সওয়ার'এর মধ্যে একজন মহিলা হওয়ার চেয়ে দেশে একজন মহিলা রাষ্ট্রপতি হওয়া অনেক বেশি দরকারি। আর বর্তমান অবস্থায়, আপনি আমাদের একজন হলে, আপনার রাষ্ট্রপতি হওয়া সম্ভবই নয়!

**ওই 'প্রাক্তন-ছাত্র গোষ্ঠী' বিষয়ে আরেকটা কথা – এই দলে এশিয়ার তেমন উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধিত্ব দেখা যায় না কেন, যখন পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা সে মহাদেশেই, আর আমেরিকাতে-ইউরোপেও এশীয়দের সংখ্যা প্রচুর?**

আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে এশিয়ার ক্ষেত্রে ধর্ম একটা বড় রাজনৈতিক সমস্যা নয়, কিন্তু সেটা ঠিক নয়। হিন্দু মৌলবাদও একটা বড় সমস্যা, আমি যতটা জেনেছি তা থেকে। আর প্রধান একজন, যাঁর কাজ থেকে আমি তা জেনেছি, তিনি একজন মহিলা – মীরা নন্দা। আপনি কি তাঁর কাজের সাথে পরিচিত? আমি আমার বইটাতে তাঁর উল্লেখ করেছি। তবে সত্যিই, আমি জানি না, এশিয়া থেকে আরো বেশি অ্যাক্টিভিস্ট উঠে আসছেন না কেন।

**হিন্দুধর্মের প্রসঙ্গে জানতে চাইব, নাস্তিক গোষ্ঠীতে খ্রীষ্টধর্ম বা ইসলামের যেমন তীব্র সমালোচনা হয়, হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্মের তেমন হয় না কেন?**

এটা হয়ত এই সরল এবং লজ্জাজনক কারণের জন্য যে, প্রধান আলোচক যাঁরা আছেন তাঁরা ওই ধর্মগুলোর বিষয়ে তেমন একটা অবগত নন। এটা আমার বিষয়ে সত্যি তো বটেই। আমার এ নিয়ে তেমন পড়াশোনা করা হয়ে ওঠেনি, তাই জঙ্গি হিন্দুত্ববাদ নিয়ে আমার জ্ঞান খুবই সীমিত।

**আরেকটা কারণ কি এই, যে এই ধর্মগুলো খানিকটা নরমপন্থী?**
আমারও তেমনই ধারণা। তবে আমার অতটা জ্ঞান নেই যে আমি নিশ্চিত হয়ে কিছু বলতে পারি।

**সম্প্রতি মস্তিষ্কের উপর স্যাম হ্যারিস এবং অন্যরা কিছু এফ-এম-আর-আই স্টাডি করেছেন, নানারকম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বা নানারকম কাজ করার সময় মস্তিষ্কের কোন কোন অংশ সক্রিয়তা দেখায়, তা নিরীক্ষণ করে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের সাথে নানা ইমোশন বা ক্রিয়ার সম্পর্ক নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে। হিউমার বা রসিকতার সঙ্গেও অমন মস্তিষ্কের সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা তো করা যেতেই পারে। এই নিয়ে আপনি কতটা উৎসাহী?**
বইয়ে আলোচিত হিউমারের ওই তত্ত্বটা মূলত ম্যাথু হার্লি-র। আমার আগেকার বই ‘কনশাসনেস এক্সপ্লেইনড’ (১৯৯১)-এর সাথে এর অনেকটা মিল আছে – এতে উপস্থাপিত চিন্তাগুলো নতুন, উদ্ভাবনী, এবং আমরা চাই না যে তাদের শুরুতেই নিউরো-অ্যানাটমির একটা প্রাথমিক, খসড়া মডেলের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলা হোক – তাতে সেই মডেলটা বর্জিত হলেই তত্ত্বগুলোও বর্জিত হবার ভয় থাকে।

আমার বেশ কিছু প্রারম্ভিক অনুমান আছে, যে কীভাবে মস্তিষ্কের চেতনার ‘বহু খসড়া তত্ত্ব’ (‘মাল্টিপল্ ড্রাফট্স্ মডেল’) কর্টেক্স ও থ্যালামাসের সঙ্গে সম্পর্কিত হবে, কিন্তু সেটাই মূল কথা নয়। সেই আন্দাজগুলো ভুলও হতে পারে ভবিষ্যতে। তাই থ্যালামাসের কেবল একটা প্রাথমিক, অপরিণত ধারণা থেকে এখনই একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে চাই না।

‘কনশাসনেস এক্সপ্লেইনড’ বইটা লেখার পর এই গত কুড়ি বছরে যা ফলাফল পরিলক্ষিত হয়েছে, তা আমার উল্লেখিত থিয়োরির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই আমি এখন তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যেতে পারি, এবং সেটা আমার একটা পরিকল্পনা, যে মস্তিষ্কের বর্তমান মডেলের সঙ্গে অন্তর্নিহিত স্নায়বিক ধারণার সম্পর্ক নিয়ে বিশদ গবেষণা করা।

একই কথা ওই জোকস-এর বইটার ব্যাপারেও খাটে। ম্যাথু, আমি ও রেজিনাল্ড ভাবনাচিন্তা করেছি, আমাদের থিয়োরিকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবার, এবং পরীক্ষার মাধ্যমে প্রত্যয়িত করার জন্য। ডেভিড হিউরন যেমন সঙ্গীতের উপর বিশ্লেষণমূলক গবেষণা করেছেন, সেইরকম। এখানে আরো অনেক কাজ করার সুযোগ আছে। তাই ঠিক এই মুহূর্তেই কিছু বলে ফেলা সম্ভব না।

**রসিকতাকে নাস্তিকতা আন্দোলনের একটা হাতিয়ার হিসাবে কি দেখা চলে? ডাবলিনের সম্মেলনে ডকিন্স বলেছিলেন, “ধার্মিকেরা যে বিশ্বাসটা আঁকড়ে বসে থাকেন, সেটা চূড়ান্ত হাস্যকর, আর সেই রূপটা উদ্‌ঘাটন করে দেওয়া জরুরী। তাই আমাদের দরকার ব্যঙ্গ, দরকার রসিকতা, … দরকার বাকচাতুর্য।”**
হা হা হা! অবশ্যই, অবশ্যই! একটা জিনিস ধর্মের সম্পর্কে সবাই লক্ষ্য করে, যে ধর্মের কোনো রসিকতাবোধ নেই। ধর্মে রসিকতার কোনো স্থান নেই – ধর্মের গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশের ঠিক বিপ্রতীপ হলো রসিকতা। ওখানে প্রয়োজন একনিষ্ঠ, ভক্তিপূর্ণ আচার-অনুষ্ঠান, আর রসিকতা এসব নিয়ম-শৃঙ্খলার ঠিক উলটো। আর তার মানে, এটা একটা দারুণ অস্ত্র।

আবার এটাও একটা দারুণ ব্যাপার যে আমেরিকাতে, ইউরোপে, ঈশ্বর বা স্বর্গ ইত্যাদি সম্পর্কে কিন্তু বেশ অনেক হাসিঠাট্টাই আছে। আর ধার্মিক লোকেরাও কিন্তু তাতে মজাই পান। তাহলে, সেসব কেন লোকের কাছে আপত্তিকর নয়? আমার মনে হয়, একমাত্র উত্তর এটাই, যে সবাই জানে ওসব আসলে গালগল্পই!

**শেষ প্রশ্ন – আপনার পরবর্তী বইটা কী বিষয়ে?**
ওটা হবে ‘মাইন্ড টুলস’ এর উপর।

*******